তালিবান আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ১

তালিবান আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ১

মঙ্গলবার ২৪/০৯/২০০২

এটি শাইখ গুলামুল্লাহ রহমতীর সাথে একটি সাক্ষাৎকারের সারসংক্ষেপ। শাইখ গুলামুল্লাহ ছিলে শাইখ জামীলুর রাহমান[১]-এর (রহ.) ডেপুটি। সাক্ষাৎকারটি প্রথম আরবি আল-বায়ান ম্যাগাজিনে ১৭০ নং সংখ্যায় ২২শে শাওয়াল ১৪২২ (জানুয়ারী-২০০২) প্রকাশিত হয়েছিলো।

প্রশ্ন: রাব্বানি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর:

সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদি'র ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাব্বানি ৬ মাসের জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই ৬ মাস কাবুল তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। কাবুল ও তার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রুপগুলোর নিয়মিত সংঘর্ষের কারণে তিনি এই সময়ে কাবুল ছেড়ে কোথাও যেতে পারেননি। কাবুলের বিভিন্ন অংশ কমিউনিস্ট ও শিয়াদের বিভিন্ন গ্রুপ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

কাবুলের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ছিল গুলাবুদ্দিন হেকমাতিয়ারের নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে রাব্বানি সে সময় আফগানের (নামেমাত্র) প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও কাবুলের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতে পারতেননা।

তার শাসনামলে তিনি এমন কিছুই করেনি যে হিসাবে আপনি বলতে পারবেন “সে এটা করেছে, ওটা করেছে”। সেসময় তার আর হেকমতিয়ার এর দলের মাঝে শুধু সংঘাত হত। যার ফলে পঞ্চাশ হাজারের (৫০,০০০) অধিক মুসলিম নিহত হয়েছিল।

সে সময় আবদু রাব্বির-রাসুল সায়াফ ও শিয়াদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। এ যুদ্ধে অনেকেই মারা যান। একই সময়ে রাব্বানি এবং দস্তম এর মধ্যে যুদ্ধে চলমান ছিল। পরে সময়ের সাথে সাথে দস্তম এর সাথে রাব্বানির সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন আসে। এক সময়তো রাব্বানি মিশর ভ্রমণকালে তার অবর্তমানে দস্তমকে তার ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে যান। সেসময় রাব্বানি দস্তম কে খুব সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। দস্তম কাবুল জয় করার কারণে রাব্বানি তাকে সময়ের শ্রেষ্ঠ জেনারেল ও বিজেতা বলে আখ্যায়িত করতেন। পরে রাব্বানির দলের সাথে দস্তম এর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় এবং রাব্বানি দস্তমকে কমিউনিস্ট, নাস্তিক, কাফির বলে ঘোষণা দেয়। রাব্বানি আরও ঘোষণা দেয় যে দস্তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাকে হত্যা করা সবার উপর ফরজ । রাব্বানির শাসনামলে এগুলো ছাড়া আর বিশেষ কিছু ঘটেনি।

প্রশ্ন: শাইখ আপনি এতক্ষণ সেসময়কার রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার জন্য যেসকল সমস্যার উদ্ভব হয়েছিলো সেগুলো নিয়ে বললেন, কিন্তু তখন আফগান সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? রাব্বানির ৬ মাসের শাসনামল বা পরবর্তী সময় বাড়ানোর পর যে ৪ বছর শাসন করেছিলো সে সময় তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে কী ধরণের পরিবর্তন এসেছিল?

উত্তর: রাব্বানির শাসনামলে দেশে দুর্নীতি, নীতিহীনতা, শোষণ, হত্যা, আইন অমান্য করা, এসব চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এমন পরিস্থিতি এর আগে কখনো হয়নি এখানে। দেশের পরিস্থিতি জনগনের সহ্য সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রাব্বানির এ ব্যাপারে কিছু করার ছিল না। রাব্বানি সে সকল কমান্ডারদের নিয়ে কাজ করতো তাদের উপর রাব্বানির নিয়ন্ত্রণ ছিলনা, এমনকি তাদের কাজের জবাব চাওয়ার সাহসও কারো ছিল না। সেসময় কোন নিরাপত্তা ছিলনা। মানুষজন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার সময়ও তার নিজের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকতো।

প্রশ্ন: আমরা পেছনের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী থেকে জানতে চাচ্ছি যে সে সময় সরকারিভাবে দেশ ও জনগনের জন্য পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা এসেছিল কিনা? ধাপে ধাপে মানুষের ও সম্পদের পুনর্বাসন ও ইসলামী শরিয়াহ বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিলো কিনা?

উত্তর: না, না, তখন এমন কিছুই করার ক্ষমতা তার ছিলোনা। কারন, তখনকার পরিস্থিতি এমন ছিল যে রাব্বানি অনেক সময় প্রয়োজন থাকলেও নিজের বাসা থেকে বের হতে পারতেন না। নিজের চারপাশ ও শহরের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যেখানে সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারছিল না সেখানে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার চিন্তাও তো মাথায় আসা সম্ভব না। যেমন, মাজার ও দরগাগুলোতে শিরকে ভরপুর ছিল। কবরগুলোকে যতভাবে পূজা করা সম্ভব তার সবই সেখানে প্রচলিত ছিল। অথচ রাব্বানি এসব ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। পাশাপাশি, জাহিলিয়াত যুগের মেয়েদের চাইতেও বেশি অশ্লীলভাবে মেয়েরা কাবুলের রাস্তাঘাটে চলাচল করতো, তাদের সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়াতো। রাব্বানি এই ব্যাপারে কিছুই

বলেননি বা করেননি। জুলুম নির্যাতন হানাহানি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কারো জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা ছিল না। শহরে ও প্রধান রাস্তাগুলোতে প্রচুর ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। এসব দেখেও রাব্বানি কিছু করেননি। তার অবশ্য কোন কিছু করার ক্ষমতাও ছিল না।

দেশে সেসময় কোন সংবিধান বা আইন ছিল না, ছিল না শরিয়তের শাসন ব্যবস্থা। আমার একটি ঘটনার কথা মনে পরে, যখন হেকমতিয়ার প্রধান মন্ত্রী হলেন তখন রেডিওতে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এখন থেকে সকল ধরণের দুর্নীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। সাথে সাথে সকল ধরণের সিনেমা হলও বন্ধ ঘোষণা করা হল। এই ঘোষণা আমি নিজে শুনেছিলাম। এই ঘোষণায় অনেকেই খুশি হয়েছিলো। তারা ভেবেছিল হেকমতিয়ার ভাল কিছু করতে যাচ্ছেন। হেকমতিয়ার এ ঘোষণাও দিয়েছিল যে এখন থেকে মেয়েরা আর রাস্তা-ঘাটে খোলামেলা পোশাক পড়ে চলাফেরা করতে পারবে না। কিন্তু সেসময় প্রকৃতপক্ষে আফগান শাসন করতো আহমাদ শাহ মাসুদ। হেকমতিয়ারের বক্তব্যের পরদিনই মাসুদ ব্যক্তিগত ভাবে ঘোষণা দিল যে হেকমতিয়ার যা ঘোষণা দিয়েছে এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ঘোষণা। এর সাথে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। এরকমটাই ছিল রাব্বানির শাসনব্যবস্থা। সে মনে রাখার বা উল্লেখ করার মত কোন কিছুই করেনি।

আলহামদুলিল্লাহ্ রাব্বানির সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই। প্রকৃতপক্ষে সে সময়কার অন্য যে কোন নেতার চাইতে রাব্বানি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর নিকটবর্তী ছিল। সে ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে ঘোষণা দিয়েছিল যে মানব রচিত আইন নয় বরং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। ক্ষমতায় যাওয়ার পর একথা ভুলে যায়। যে বা যারাই রাব্বানির সাথে সন্ধি করতো তারা হয়ে যেত তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যে বা

যারা তার বিরোধিতা করতো তাদের সে শত্রু হিসেবে গণ্য করতো ও তাদের রক্ত সে নিজের জন্য হালাল মনে করতো।

প্রশ্ন: কেউ কেউ সেসময় বলে যে, রাব্বানি সরকার ছিলো শরিয়াহ ভিত্তিক সরকার এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

উত্তর: শরিয়াহ বিষয়ে নুন্যতম জ্ঞান আছে এমন কেহই রাব্বানির শাসনব্যবস্থাকে শরিয়াহ ভিত্তিক বলতে পারবে না। যে সরকার গঠনই করা হয়েছে মাত্র ২-৬ মাস মেয়াদের জন্য, প্রয়োজন শেষ হলে সেটা ভেঙ্গে ফেলা হবে তাকে কিভাবে শরীয়াহ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বলা যায় ? এই শর্ততেই তো বোঝা যায় যে এটি শরিয়াহ ভিত্তিক কোন শাসনব্যবস্থা ছিলনা।

প্রশ্ন: কিন্তু সেই ৬ মাস তো ছিলো নির্বাচনপূর্ব পর্যন্ত অস্থায়ী সরকার ব্যবস্থা।

উত্তর: হ্যা, আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু রাব্বানি পরবর্তীতে একতরফাভাবে নিজেই সরকারের মেয়াদ বাড়িয়ে নেয় এবং ঘোষণা দেয় যে ‘আমিই এখানকার বৈধ শাসক এবং এই সরকার আমিই চালাব । তার এই ঘোষণার ফলে বিভিন্ন গ্রুপগুলোর মধ্যে মারামারি হানাহানি শুরু হয়। এই ঘটনা থেকেই বলা যায় যা পরিপূর্ণ শরিয়াহ ভিত্তিক সরকার হওয়ার জন্য যেসকল শর্ত পূরণ অত্যাবশ্যক রাব্বানির সরকারের ক্ষেত্রে সেসকল শর্ত পুরণ হয়নি।

এছাড়াও একটি ভূমিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সেখানকার মানুষের উপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকা জরুরী যা রাব্বানির ছিল না। আবার যেকোনো রাষ্ট্রে আইন বাস্তবায়ন ও জনসাধারাণের উপর আইন প্রয়োগের দায়ভারও সরকারের উপর। এ ক্ষেত্রেও রাব্বানি ব্যর্থ । প্রকৃতপক্ষে নাজীবুল্লাহ এর শাসনামলে যারা সরকারের বিভিন্ন পদে ছিল তারাই রাব্বানির শাসনামলে

সরকারের বিভিন্ন পদে বহাল ছিল। তাই রাব্বানির সরকার শুধু নামে ছিল কাজেকর্মে তা নাজিবুল্লাহর সরকারের মতোই চলছিল।

প্রশ্ন: তাহলে আমরা কি একথা বলতে পারি যে রাব্বানির শাসনামলে সারা দেশে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো এটিই তালিবান আন্দোলনের উত্থানের মুল কারণ হিসেবে কাজ করেছে?

উত্তর: হ্যাঁ। আমি আসলে এটাই বলতে চাইছিলাম। আসলে রাব্বানির সরকারই তালিবান আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল। যখন একটা দেশ অন্যায়,শোষণ ও দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছিল তখন স্বাভাবিক উপায়ে এটাকে কমানো অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। তাই পরিস্থিতির দাবিই ছিল যে এমন একটা পরিবর্তন আসতে হবে যেন সমাজের প্রত্যেকটা স্তর ঝাঁকি খায়। আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে কী ধরণের অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়নে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তখন আফগানে বিরাজ করছিলো। যার ফলশ্রুতিতে তালিবান আন্দোলন শুরু হয়েছিলো।

অনেকগুলো কারণেই অনেক দিন ধরে তালিবান আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি হচ্ছিল। মূলত যে ঘটনার মধ্য দিয়ে তালিবান আন্দোলনের সূচনা হয় সেটি হল- মোল্লা উমর ছিলেন একজন তালিবুল ইলম। ইলম অর্জনের পেছনে খুব বেশি সময় দেয়ার সুযোগ তিনি পাননি। ইতোপূর্বে তিনি একটি জিহাদি সংগঠণের সাথে যুক্ত হয়ে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহার করার পর তিনি এটা ভেবে ফেরত আসলেন যে, এখন তো মুজাহিদীনদের দ্বারা গঠিত সরকার পরিচালিত, এখন আর জিহাদের প্রয়োজন নেই। তাই তিনি আবার পাকিস্তানে ফিরে জ্ঞান অর্জনে মনোযোগ দিলেন।

একদিন মুহাম্মাদ উমর তার মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় তার এক আত্মীয় তার কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন। মুহাম্মাদ উমর তার কাছে জানতে চাইলেন তার কোন আত্মীয় মারা গেছেন কিনা। লোকটি উত্তরে বললেন " যা ঘটেছে তার চাইতে কেউ যদি মারা যেত সেটিও অনেক ভাল ছিল। এই ঘটনার আগে যদি আমরা সবাই মারা যেতাম সেটিও অনেক ভাল হত।" এরপর লোকটি মুহাম্মাদ উমরকে ঘটনাটি বললো । লোকটির বাড়ি ছিল মধ্য আফগানের রুযগান এলাকায়। তার স্ত্রী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাকে পাকিস্তান নিয়ে আসবেন। এ উদ্দেশে তিনি একটি গাড়ি ঠিক করলেন। সে সময় আফগানের একেক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতো একেক নেতারা। এই সকল নেতারা যে অঞ্চল দখল করতো সেখানকার লোকজনের উপর কর ধার্য করতো এবং ঐ এলাকার উপর দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে তার থেকে "টোল" আদায় করতো।

লোকটি যাত্রা শুরু করলো। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবেশ করা মাত্রই সেখানকার চেক পয়েন্ট তাকে ও তার স্ত্রীকে বাঁধা দেওয়া হতো ও তাদের থেকে টোল আদায় করা হতো। এভাবে চলতে চলতে পরিস্থিতি এমন হল যে তার টাকা প্রায় শেষ। শেষে একটি চেক পয়েন্টে তাকে থামিয়ে সেখানকার নেতা তার কাছে টোল চাইলে সে জানায় যে, পূর্ববর্তী চেক পয়েন্টে সকল অর্থ নিয়ে নিয়েছে। সে আরও জানায় তার স্ত্রী খুব অসুস্থ ও তাকে চিকিৎসার জন্য পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া জরুরী। তখন আঞ্চলিক শাসক বলল "তাহলে তোমার স্ত্রীকে এখানে রেখে যাও। আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি"।

লোকটি সরল মনে জানতে চাইলো "তোমাদের এখানে কি ক্লিনিক আছে?"। উত্তরে সে বলল "না, তুমি তোমার স্ত্রীকে আমার কাছে তিন রাতের জন্য রেখে যাও। ফিরে এসে দেখবে সে পরিপূর্ণ সুস্থ"। লোকটি বুঝতে পারলো

আঞ্চলিক শাসকের উদ্দেশ্য ভাল নয়। এক-দু'কথায় তাদের মাঝে মারামারি শুরু হল। এর মধ্যে শাসকের লোকেরা চলে আসে এবং সবাই মিলে মারতে মারতে লোকটিকে প্রায় আধমরা করে ফেলে। তারা ভেবেছিল লোকটি মারা গেছে। এরপর নেতার লোকেরা লোকটিকে একটা ঘরে ফেলে রেখে তার স্ত্রীকে বন্দী করে নিয়ে চলে যায়। রাতে লোকটির জ্ঞান ফিরে। লোকটি বুকের উপর ভর করে অনেকখানি এলাকা পার হয়ে পালাতে সক্ষম হয় ও মোল্লা উমরের কাছে আসেন। সবকিছু শুনে মোল্লা উমর তার আত্মীয়কে বললেন "এখানে অপেক্ষা করো। ছয়দিন পর আমি আফগানিস্তানে ফেরত যাবো। তুমি যা বলছ তা ইসলামকে অপসারণ করার শামিল। এখন থেকে ছয়দিন পর আমি আফগানের কান্দাহারে যাব। সেখানে আমার কিছু ভাই এর সাথে আলোচনা করতে হবে। আলোচনার পর ফিরে এসে তোমাকে সাথে নিয়ে আবার আফগানে ফিরে যাব"।

এরপর মোল্লা উমর তার যে সকল মুজাহিদিন ভাইদের সাথে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন তাদেরকে একত্রিত করলেন। তারা ছিলেন প্রায় ১৭ জনের মত এবং এরাই পরবর্তীতে মোল্লা উমরের সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। মোল্লা উমর তাদেরকে একত্রিত করে তার আত্মীয়ের ঘটনাটি বললেন ও তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে "আমরা এত বছর ধরে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছি কি এই আফগানের জন্য? মানুষের উপর অন্যায়, অত্যাচার ও নৈতিকতার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের জিহাদের ফল কি হারিয়ে যাবে? আমার মনে হয় ইসলাম এই পরিস্থিতিতে আমাদের যা করতে বলে আমাদের এখন তাই করা উচিত। দেশের এই অরাজক পরিস্থিতিতে আমাদের এখন ইলম বৃদ্ধি করার সময় নয়। বরং সময় এখন আমাদের অর্জিত জ্ঞান এই শোষকদের বিরুদ্ধে বাস্তবায়িত করার। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আবার জিহাদ করবো। বাকি সবাই এই ব্যাপারে একমত হলেন যে এখন আবার জিহাদে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে।

তারা সবাই সংকল্পবদ্ধ হলেন, তাদের অস্ত্রগুলো আবার হাতে তুলে নিলেন। যে চেকপয়েন্টে মহিলাটিকে তুলে নেওয়া হয়েছিলো তারা সেখানে তীব্র আঘাত করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে সেখানকার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের কেউ মারা যায়, কেউ কেউ আটক হয় আর বাকিরা পালিয়ে রক্ষা পায়। আঞ্চলিক নেতাকে আটক করা হয় ও তার জঘন্য কাজের শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়। তার বাহিনীর লোকএরাই মোল্লা উমরকে জানালো যে তাদের এই লোকটি ছিল দুর্নীতিগ্রস্থ ও নোংরা চরিত্রের । কিন্তু তারা তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারত না কারণ কেউ বিরোধিতা করলেই সে তাকে মেরে ফেলত। তারা সেখানে ৫০০ জন এর মত সৈনিক ছিল। তারা মোল্লা উমর কে বলল –"আপনি উত্তম কাজ করেছেন এবং আমরা আপনার সাথে আছি"।

এরপর মোল্লা উমর ও তার বাহিনী কাছাকাছি আরেকটি এলাকার দিকে যাত্রা শুরু করলেন । সেখানকার আঞ্চলিক শাসক সম্পর্কেও অন্যায় অত্যাচার-শোষণের কথা শোনা যায়। তারা পথে থাকতেই ঐ এলাকার শাসক খবর শুনে পালিয়ে যায়। নতুন এই এলাকা থেকেও অনেক যোদ্ধা মোল্লা উমরের বাহিনীতে যোগ দেয়। এভাবে তারা এক এক এলাকা পার হওয়ার সময় ঐ এলাকা জয় করতে থাকেন এবং প্রায় কোন যুদ্ধ ছাড়াই তারা কান্দাহারে প্রবেশ করেন।

এরপর মুসলিম বাহিনী হেলমান্দ এর দখল নেন। এ সময় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে আন্তঃদেশীয় সম্পর্ক ভাল ছিলো না। মাসুদের পররাষ্ট্রনীতি ছিল সরাসরি পাকিস্তান সরকারের স্বার্থবিরোধী। মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ দেখার চাইতে সে রাশিয়ানদের স্বার্থ নিয়ে বেশি চিন্তা করতো। রাশিয়ার আরেক মিত্র ফ্রান্সও মাসুদকে খুব পছন্দ ও সহযোগিতা করতো। এমনকি মাসুদের উপদেষ্টা

কমিটিতে ফ্রেঞ্চরা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতো। পাকিস্তান সরকার ভয় পাচ্ছিলো যে, রাব্বানির সরকারই হয়তো আফগানে স্থায়ী হয়ে যাবে। আর এই সরকার যেভাবে নিয়মিতভাবে রাশিয়ার সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং যেহেতু এর থেকে পেছন ফেরার কোন সম্ভাবনাই নেই কেননা দিন দিন সহযোগিতা কেবল বাড়ছে, সেহেতু ভবিষ্যতে এই সরকার পাকিস্তানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। কারণ রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক ভাল। আবার ভারত পাকিস্তানের শত্রু। স্বভাবতই পাকিস্তান রাব্বানি সরকারকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ দেখছিল। তাই পাকিস্তান সরকার যখন আফগানে মোল্লা উমরের নেতৃত্বে তালিবান আন্দোলনের কথা জানতে পারলো তখন তারা এই সুযোগটি নিজেদের কাজে লাগাতে চাইলো। তারা মোল্লা উমরের সাথে যোগাযোগ করলো এবং তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিল।

মোল্লা উমর একের পর এক প্রদেশ জয় করতে লাগলেন। তিনি যখন হেকমতিয়ার এর এলাকায় পৌঁছান হেকমতিয়ার তখন তার সমস্ত ধ্যান জ্ঞান এক করে রাব্বানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। রাব্বানি, মাসুদ ও সায়াফ এই সুযোগটি কাজে লাগালেন। হেকমতিয়ারের সাথে মোল্লা উমরের যোগাযোগ করার আগেই মোল্লা উমর এর সাথে তারা যোগাযোগ করে। তারা তালিবান নেতাদের সাথে সভা করে তাদেরকে স্বাগত জানান এই বলে যে আপনারা এই দেশ ও উম্মাহ এর জন্য অনেক কিছু করেছেন। আফগানিস্তানকে শাসন করার সবচাইতে উপযুক্ত ও হকদার আপনারাই।

তালিবানদের নিয়মটা এমন ছিল যে, যখনি তারা নতুন কোন এলাকা জয় করতেন সেখানে তারা একটি মজলিশে শুরা গঠন করে দিতেন। এই কমিটির কাজ ছিল সকল ধরনের সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। এরপর তারা বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি দেয়ার জন্য শরীয়া আইন

চালু করতেন। এর ফলে সেখানকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুব দ্রুত উন্নতি হত। একই নিয়ম সবগুলো দখলকৃত এলাকায় প্রয়োগ করার ফলে শীঘ্রই সারা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি হয়। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর চাইতে ভালো হয়তো ছিল না, কিন্তু তাদের তুলনায় খারাপ ছিল এটাও বলা যাবে না। দীর্ঘদিন যুদ্ধ বিগ্রহ ও যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে একটি অরাজক ও নিপীড়নের পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে আফগানের সকলেই খুশি ছিল। তখন রাব্বানি তালিবানদের সাথে একটি চুক্তিতে আসলো। তালিবানরা যদি জুলুমকারী ও অন্যায়কারী ভুমি দস্যুদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এভাবে কাবুল পর্যন্ত পৌছাতে পারে তাহলে রাব্বানি ক্ষমতা থেকে সরে দাড়িয়ে তালিবানদের হাতে তুলে দিবে। মাসুদ ও সায়াফ তখন তালিবানদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা শুরু করল। তাদের এই সাহায্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল তালিবানদের সাহায্যে হেকমতিয়ার এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া। এরপর তালিবানরা হেকমতিয়ার এর এলাকার দিকে মনোযোগ দেন। তালিবানরা হেকমতিয়ার এর বাহিনীর উপড় আক্রমণ চালালে তিনি তেমন কোন প্রতিরোধ যুদ্ধ না করেই লাঘমান পালিয়ে যান। যাওয়ার সময় তিনি তার বাহিনিকেও তার সাথে পালিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু এই বাহিনীর অনেকেই পরে হেকমতিয়ার এর সাথে না যেয়ে তালিবানদের সাথে যোগদান করেন। ফলে তালিবানরা খুব সহজেই অল্প যুদ্ধে হেকমতিয়ার এর এলাকা দখল করতে সমর্থ হন। এরপর তালিবানদের সম্মিলিত বাহিনী কাবুল এর দিকে যাত্রা শুরু করেন। তারা কাবুলে প্রবেশের পূর্বে রাব্বানিকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করার দাবি জানান।

জবাবে রাব্বানি তাদেরকে বলল "তোমরা কি পাগল হয়েছ? তোমরা একবারেই সাধারণ কয়েকজন মাদ্রাসার ছাত্র। তোমরা আফগান শাসন করবে কিভাবে? অথচ আমি হলাম আফগানের বৈধ সরকার প্রধান। আমি দেশের ভিতরের বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের লোকজন ও বাইরের অনেক রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত আফগানের রাষ্ট্রপ্রধান। দেশ শাসন আমাদের হাতে ছেড়ে তোমাদের এখন মাদ্রাসায় ফিরে যেয়ে পড়ালেখায় মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। এ কথা শোনার পর আফগান সরকার ও তালিবানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

কাবুলে তালিবানদের শত্রুপক্ষ ছিল তিনটি যাদের সাথে একই সময়ে একসাথে যুদ্ধ চলছিল। একটি দল ছিল আব্দুল আলি মাযারী এর শিয়া বাহিনী। হেকমতিয়ার এর বাহিনীর পর এই দলটির সৈন্য সংখ্যা সবচাইতে বেশি ছিল। তালিবানদের সাথে যুদ্ধে আব্দুল আলি মাযারী নিহত হয়। দ্বিতীয় দলটি ছিল সায়াফ এর দল। তৃতীয় দলটি ছিল রাব্বানি-মাসুদ এর দল। এই তিনটি দলের সাথেই কোন চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়া তালিবানরা যুদ্ধ করে চলছিল। যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় যখন রাব্বানি দ্বিতীয়বারের মত আবার হেকমতিয়ার এর সাথে মিত্রতা করে। সে হেকমতিয়ার এর কাছে এই তথ্য দিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল যে "তুমি আর আমি ভাই ভাই। আর তালিবানরা আমাদের দুইজনেরই শত্রু। এসো এদের একসাথে মোকাবেলা করি"। সে হেকমতিয়ারকে কাবুলে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাকে আফগানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে। তাদের দুইজনের আদর্শিক পার্থক্য শেষ হবার নয়। ফলে কয়েকদিন যেতে না যেতেই তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য আবার স্পষ্ট হয়ে উঠে। হেকমতিয়ার সারা দেশে অন্যায় অত্যাচার, দুর্নীতি, মানুষের নৈতিকতার অবনমন এগুলো কমানোর জন্য নানা উদ্যোগ নিতে শুরু করেন। তিনি এগুলোর পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন পদে চাকরিরত মহিলার সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে সোচ্চার হন। এসব দেখে মাসুদ ক্ষোভে ফেটে পরে

এবং হেকমতিয়ারকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। এদিকে কাবুলে তালিবানদের সাথে হেকমতিয়ার, মাসুদ ও রাব্বানির দলের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে তালিবানরা বিজয় লাভ করে এবং রাব্বানি ও হেকমতিয়ারকে কাবুল থেকে উত্তরে বের করে দেয় । এর ফলে পুরো আফগানের নিয়ন্ত্রণ তালিবানদের হাতে চলে আসে।

প্রশ্ন: তালিবানরা প্রথম কাবুলে প্রবেশের পর তাদের আচরণ কেমন দেখেছেন?

উত্তর: তালিবানরা ক্ষমতায় যাওয়ার কয়েক মাস পর তারা আফগানের বিভিন্ন মাজার- খানকাগুলো বন্ধ ঘোষণা করে। তারা ঘোষণা করে যে এসকল মাজারে যে ধরণের কাজ হয় তা শিরক। তাই এখন থেকে এ ধরনের কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। আপনি হয়তো বিখ্যাত "মাজার-ই-শরিফ" এর কথা শুনে থাকবেন। দাবি করা হয় যে এটি আলি বিন আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কবরের উপর তৈরি করা হয়েছে। এই মাজারটিকে আফগানে 'সাখী' (দাতা) বলে ডাকা হয়। সাখী নামে আফগানে বুঝানো হয় এমন একজন যার কাছে যে কেউ যা চাবে তাই পাবে। নারী-পুরুষ, অন্ধ, বধির,পঙ্গু সকলেই এই মাজারে যেত এই আশায় যে 'সাখী' তাদের মনের সকল আশা পূরণ করবে। মাজারকে কেন্দ্র করে অনেক ধরণের কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। অনেকগুলো আমার জন্মের পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এর মাঝে একটি ছিল নওরোজ এর দিন মাজারে নতুন পতাকার উত্তলন। প্রাচীনকাল থেকেই আফগানে নতুন কোন রাজা নির্বাচিত বা জয়ী হলে নওরোজের দিন রাজার রাজ্যের স্থায়িত্ব কেমন হবে তা জানার জন্য তারা মাজারের উপর নতুন একটি পতাকা উত্তোলন করতো। যদি পতাকা ঠিকভাবে উড়তে থাকে তার মানে হল এই রাজার রাজত্ব দীর্ঘদিন টিকবে। আর যদি পতাকা না উড়ে পরে যায় তার মানে হল শীঘ্রই এই রাজার রাজত্ব

শেষ হয়ে যাবে। এই পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে সারা দেশে তিন দিনের সরকারি ছুটি থাকতো। সারা দেশ থেকে মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতো। বলা হয়ে থাকে যে হজ্জ এর মৌসুমে মক্কাতে হাজীদের যে সমাগম হতো তার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ হতো এই 'সাখী' মাজারে নওরোজ এর সময়। তালিবানরা ক্ষমতায় আসার পর নওরোজ এর সময় আসলে তারা ঘোষণা করলো যে সাখী মাজারে পতাকা উত্তোলন এর যে কাজটি করা হয় তা ইসলাম ও শরীয়াহ বহির্ভূত। তাই এই বছর থেকে এই ধরণের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। নওরোজের তিন দিন এখানে কোন মানুষজন এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশে আসতে পারবে না। এই তিন দিন কোন সরকারি ছুটিও থাকবে না। কেউ যদি এই তিন দিন অফিসে না আসেন তাহলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

এভাবেই তারা মাজার কেন্দ্রিক যে শিরক চলত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। তারা প্রথমে কাবুল থেকে শুরু করেছিলো এরপর পুরো আফগানেই তারা এ ধরণের শিরক বিদআত বন্ধ করেছিলো। সারা আফগানেই এ রকম অসংখ্য মাজার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তালিবানরা আসার পর নিয়ম করা হল যে এ সকল মাজারে মানুষজন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার যোহর থেকে আসর পর্যন্ত জিয়ারত এর উদ্দেশে যেতে পারবে। তারা ঘোষণা করে দিয়েছিল কেউ যদি কবরে শায়িত লোকের কাছে কিছু চাইতে আসে বা অসুস্থতা থেকে মুক্তি চায় অথবা আল্লাহ্ এর কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে এই সকল কবরবাসীদেরকে মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করে এই প্রত্যেকটি কাজই শিরক। যে বা যারা এ ধরণের কাজ করবে এবং তওবা করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে প্রহার করা হবে অথবা জেলে বন্ধী করা হবে। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। এ সবকিছুই রাব্বানির সরকারের পর তালিবানরা ক্ষমতায় আসার পর করেছিলো।

প্রশ্ন: মাজার বন্ধ ও শিরক নিষিদ্ধকরণ এর সময়কার আপনার কোন অভিজ্ঞতা মনে আছে কি? আপনার নিজের দেখা বা শোনা কোন ঘটনা?

উত্তর: হ্যাঁ। আমার নিজের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। কাবুলের খুব বিখ্যাত ও পরিচিত মাজার হল শহীদ শামশেরা; যার মানে হলো দুই তলোয়ারধারী রাজা। কাবুলের খুব প্রচলিত একটি গল্প হল এই রাজা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতো দুইটি তলোয়ার দিয়ে। একবার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দুইটি তলোয়ারই ভেঙ্গে যায় ও সে শাহাদাত বরণ করে। যেখানে সে মারা যায় সেখানেই তাকে দাফন করা হয় ও এর উপরই এই মাজার গড়ে উঠে। এখানে শিরক করার যত উপায় আছে তার সবগুলোই প্রয়োগ করা হতো। আমি নিজে এই মাজারটিতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেয়ালে ও পাথরের উপর অসংখ্য শিরক ও কুফর প্রকাশ পায় এমন কথা লেখা ছিল। মাজারের কবরের উপর পশতু ভাষায় যে লেখাটি ছিল তা অনেকটা এমন "তুমি ছাড়া আমাদের কোন উপায় নাই"। এরকম আরও অনেক লেখা ছিল সেখানে।

এ সময় একটা কাজে আমাকে কাবুল আসতে হয়েছিলো। সেখানে একটা অনুষ্ঠানে শাইখ রাব্বানির সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে বললাম "আপনারা সবাই মিলে ঘোষণা দিয়েছেন যে আফগান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র এবং আপনাদের সরকার একটি ইসলামিক সরকার। তাহলে শিরক এর এসব কেন্দ্রগুলো বন্ধ করছেন না কেন?" রাব্বানি হেসে ফেললেন এবং বললেন-"শাইখ আপনি রাতারাতি একটি পরিপূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্রের কথা বলছেন, যা অসম্ভব। আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। "আমি বললাম- "এই লোকগুলো যারা শিরক এ লিপ্ত আছে তারা যদি এর উপর মারা যায় তাহলে তাদের কি হবে? এর দায়ভার কে নিবে? এমন কেউ থাকা উচিত যিনি সৎ কাজের আদেশ দিবেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবেন। "উত্তরে

হেসে দিয়ে তিনি বললেন- "একটি দেশে একটি ইসলামিক সরকার হুট করেই সবকিছু করে ফেলতে পারে না। এর জন্য সময় দেওয়া লাগে"।

কিন্তু তালিবানরা আসার পর আমি দেখলাম যে তারা অল্প সময়ের মাঝেই এগুলো বন্ধ করে দিল। তারা মাজারগুলো থেকে সবকিছু বের করে দিয়ে এগুলো সিলগালা করে দিল ও মাজারে শরীয়াহ বহির্ভূত কোন উপায়ে জিয়ারত করাকে নিষিদ্ধ করে দিল।

তালিবানরা যখন কাবুলের ক্ষমতা গ্রহণ করলো তখন পেশওয়ারে একথাটি খুব প্রচলিত ছিল যে তালিবানরা আমেরিকার এজেন্ট। আফগানিস্তানে আসার পূর্বে আমি ভাবতাম যে এই তালিবানরা কারা? তারা কি আমেরিকার এজেন্ট নাকি পাকিস্তানের এজেন্ট? তাদের ব্যাপারে এটাও বলা হতো যে, আফগানের অন্যান্য আরো অনেকের মতো তারাও কবরপূজারী এবং আশআরী-মাতুরিদীদের এর একটি শাখা যারা কুসংস্কার ও নানা কিচ্ছাকাহীনিতে বিশ্বাসী। এগুলো সবই আমার আফগানে আসার আগে শোনা। আমি নিজেও যখন আফগানে আসি তখন খুব সাবধানে লুকিয়ে এসেছিলাম এই ভয়ে যে এই সকল কবরপূজারীদের হাতে পড়লে হয়তো তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

আমি পাকিস্তান থেকে আফগানে সাবধানে লুকিয়ে আসার জন্য একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। ট্যাক্সিতে অন্যান্য যাত্রী বলতে একজন পুরুষ সাথে তার স্ত্রী ও দু'টি বাচ্চা। একজন ছেলে অপরজন মেয়ে ছিল। লোকটির সাথে ছিল একটি বস্তা। বস্তাটি জিনিসপত্রে এমনভাবে ভরা ছিল যে দেখতে অনেকটা বালিশের মত লাগছিল। আমারা কাবুল পৌছলে লোকটি প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে তার বস্তাটি একটা রেস্টুরেন্ট এর সামনে রাখল। এরপর সে তার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে নামতে সাহায্য করলো। তারা নামার পর আমিও নামলাম ও একটা হোটেলে রুম নিয়ে রাতটা সেখানেই কাটালাম।

পরদিন সকালে আমি যখন ঐ রেস্টুরেন্ট এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম দেখলাম যে গতকাল লোকটি তার বস্তা যেখানে রেখেছিল সেখানেই আছে। আমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম-" গতকাল লোকটা যে বস্তা সাথে করে নিয়ে এসেছিল ও এই রেস্টুরেন্ট এর সামনে রেখেছিল এটাই কি সেই বস্তা?" সম্ভবত এটি অন্য কোন বস্তা এই ভেবে আমি এটি নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামালাম না। ২ দিন পর আমি যখন রেস্টুরেন্ট এর সামনে দিয়ে পার হচ্ছিলাম ব্যাগটা তখনো সেখানেই ছিল।

এরও তিনদিন পর আমি আবার রেস্টুরেন্ট এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম ব্যাগটি তখনো সেখানেই ছিল। আমি 'শামশেরা' মাজারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি ভাবছিলাম যে -"তালিবানরা কবর পূজার ক্ষেত্রে আর নতুন কী কী শিরক এর সমাবেশ ঘটিয়েছে তা মাজারে গেলেই দেখা যাবে"। আমরা মাজারে যেয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে সেটি তালা লাগানো। আমার সাথে আরও চারজন বন্ধু ছিল তারাও তালিবুল ইলম। আমরা দরজায় নক করলাম। একজন বৃদ্ধ লোক এসে দরজাটি খুলে দিলেন। আমরা দেখলাম তার মুখটি মলিন ও দুঃখ ভারাক্রান্ত।

প্রশ্ন: দুঃখিত শাইখ, আপনি এখনো বস্তার ঘটনাটি শেষ করেন নি...।

উত্তর: আমি ব্যাপারটি ভুলে যাইনি, ঘটনাটি পরে বলছি...

মূল

http://www.islamweb.net/prophet/index.php?page=showarticle&id=২৯৪২৯

(ইনশাআল্লাহ্ চলবে)

—

[১] মৌলভি জামিলুর রহমান। জন্ম ১৯৩৯ সালে, মৃত্যু ১৯৯১। ১৯৯১ আফগানিস্তানের কুনারে সালাফি ইমারতের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দলের নাম ছিল জামাতুদ দাওয়াহ ইলাল কুরআন ওয়া আহলে হাদিস। সৌদি আরব ও কুয়েত এই দল ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ইমারতকে সমর্থক করে। ১৯৯১ সালের আগস্টে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।